অধ্যায় ১০ : শিবায়ন

বিন্যাসক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য ও শিবায়ন
১০.৪ শিবায়ন'এর কবি পরিচয় – রামেশ্বর ভট্টাচার্য
১০.৫ কাহিনি সংক্ষেপ
    ১০.৫.১ চাষপালার সারসংক্ষেপ
    ১০.৫.২ বাগদীপালার সারসংক্ষেপ
    ১০.৫.৩ শঙ্খপালার সারসংক্ষেপ
১০.৬ চরিত্র বিশ্লেষণ
১০.৭ নামকরণ
১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১০ অতিরিক্ত পঠন
১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

আপনি এই অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারবেন—

১। ভারতীয় সাহিত্যে দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ শিব চরিত্রটি বিভিন্ন রূপে ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় শিবের লৌকিক রূপ।

২। কাব্যটিতে মোট আটটি পালা রয়েছে। প্রথম তিনটি পালা পর্যন্ত কবি পুরাণের অনুসরণ করেছেন। তবে, তৃতীয় পালার মাঝামাঝি থেকে কবি লৌকিক কাহিনি অনুসরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ পালা থেকে পূর্ণরূপে লৌকিক শিবকে দেখতে পাওয়া যায়। এই পালায় শিব কৈলাস ত্যাগ করে চাষবাস করতে শুরু করেছেন। বাগদিনী পালায় দেখা যায়, মাতা পার্বতী বাগদিনীর বেশ ধারণ করে শিবের সঙ্গে মাছ ধরছেন, জাগরণ পালায় দেবী পার্বতীর শাঁখা পরার ইচ্ছে প্রকাশ এবং শিবকর্তৃক দেবীকে শাঁখা পরানো— ইত্যাদি।

৩। কবি-পরিচয়, মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ, শিবায়ন কাব্যের নির্বাচিত অংশের কাহিনি এবং চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ বা আলোচনাকে অবলম্বন করে আপনি অধ্যায়ের শেষে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে সক্ষম হবেন।

১০.৩ মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য ও শিবায়ন

বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত লৌকিক, পৌরাণিক এবং লৌকিক-পৌরাণিক মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের বহু আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। এই আখ্যান কাব্যগুলো একজন বিশেষ মঙ্গলময় দেবতা বা মঙ্গলময়ী দেবীর পূজা-প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হত। —এই বিশেষ ধরনের কাব্যগুলোকে মঙ্গলকাব্য বলে। এই ধরনের কাব্যে 'দেবখণ্ড' নামের একটি বিশেষ খণ্ড দেবতাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। সেই খণ্ডে প্রাধান্য পেত দেবচরিত্ররা। সেখানে বর্ণিত হত, দেবদেবীদের বিভিন্ন ধরনের লীলা। দেবখণ্ড ছাড়া স্থান পেত 'নরখণ্ড'। সেখানে স্থান লাভ করত— দেবদেবীদের প্রতি ভক্তদের অসীম ভক্তিতে তুষ্ট দেবদেবী কর্তৃক ভক্তদের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা পূরণ ইত্যাদি বিষয়ক ঘটনা। বলা বাহুল্য, সাধারণত এই নর চরিত্ররা হতেন শাপভ্রষ্ট দেবী-দেবতা।— এইগুলো ছিল সেই সময় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে, সাধারণ মঙ্গলকাব্যের থেকে শিবায়ন আলাদা। শিবায়নে দেবখণ্ড বা নরখণ্ড জাতীয় কোনো ভাগ নেই। শিব ঠাকুরের পূজা প্রচারেরও কোনো ধরনের কাহিনি শিবায়নে নেই। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো শিবায়নে নেই।

প্রচলিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলোর থেকে রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য) রচিত শিবায়নের বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

- শিবায়ন কাব্যে রামেশ্বর দেব চরিত্রের মানবায়ন করেছিলেন।
- দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি স্থান পেয়েছে তাঁর এই কাব্যে।
- এই কাব্যে কবির রঙ্গরস এবং আদিরসের প্রতি আকর্ষণও দেখতে পাওয়া যায়।

১০.৪ শিবায়ন'এর কবি পরিচয় – রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শিবায়ন শাখার সব থেকে জনপ্রিয় কবি হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য)। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে হয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রপিতামহ থেকে তাঁরা চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী আবার 'ভট্টাচার্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতার নাম রূপবতী। সুমিত্রা এবং পরমেশ্বরী হলেন কবির দুই স্ত্রী। মোগল আমলে উদ্ধত জমিদার হেমন্ত সিংহের অত্যাচারে কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেখান থেকে কবি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন। রামসিংহের সভায় তিনি পুরাণ পাঠকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় তিনি চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তন্ত্র মতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহ জমিদারি লাভ করেন। সেই সময় কবি যশোমন্ত সিংহের সভাকবির পদ লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তাঁর সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'শিব-সঙ্কীর্তন' বা শিবায়ন কাব্যটি সমাপ্ত করেছিলেন। সময়টা ছিল আনুমানিক ১৭১১-১৭১২ খ্রিস্টাব্দের পর। এই কাব্যের বেশ কয়েকটি পুথি পাওয়া গেছে। আধুনিক যুগে বেশ কয়েকজন এই পুথির সম্পাদনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঈশানচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পঞ্চানন কর্মকার, তারকনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আনুমানিক ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। কর্ণগড়ের মন্দিরের কাছে তাঁর সমাধির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

কবি রামেশ্বরের কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাব্যটি মোট সাতটি পালা এবং একটি জাগরণ আরম্ভ পালায় বিভক্ত। তৃতীয় পালার বেশ কিছুটা পর্যন্ত কাহিনি পুরাণ অনুসারেই এগিয়েছে। আবার তৃতীয় পালার মাঝামাঝি থেকে কাব্যে লৌকিক কাহিনির অনুসরণও লক্ষ করা যায়। তবে, যথার্থ লৌকিক কাহিনি স্থান পেয়েছে, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং জাগরণ পালায়। কবি রামেশ্বর পাণ্ডিত্যে, বাস্তব সংসার জীবনের অভিজ্ঞতায়, হাস্য-পরিহাস উপস্থাপনায়— ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। শিবায়ন ছাড়া তিনি আরও বেশ কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেগুলো হল— সত্যপীরের ব্রতকথা, শীতলামঙ্গল (মগপূজা পালা), সত্যনারায়ণের ব্রত কথা (আখোটী পালা)। এই কাব্যগুলোর মধ্যে শিবায়নকে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। শিবায়ন কাব্যের কবি পরিচয় তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৫ কাহিনি সংক্ষেপ

১০.৫.১ ৬ষ্ঠ পালায় (চাষপালা) স্থান পেয়েছে— দেবী সতী গিরিরাজের ঔরসে মেনকার গর্ভে গৌরী রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। আশৈশব তিনি শিবকে পতিরূপে কামনা করতেন। মেয়ের আবদারের কাছে নত হয়ে গিরিরাজ ভিক্ষুক শিবের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হলেন। প্রাসাদ ত্যাগ করে গৌরী কৈলাস স্বামীর কুটিরে এসে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অভাবের সংসারে অনটন ছাড়ে না। এখান থেকেই চাষপালার কাহিনি শুরু। ভিক্ষুক শিবের পুঁজি শেষ হয়ে আসছিল, অনাহারের ভয়ে গৌরী শিবকে চাষ করার পরামর্শ দিলেন। অলস প্রকৃতির শিব প্রথমে অসম্মত হলেও পরে রাজি হলেন। গৌরীর পরামর্শে ইন্দ্রের থেকে তিনি জমি পাট্টা নিলেন। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নিজের ত্রিশূল গলিয়ে লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম তৈরি করিয়ে নিলেন। তারপর গৌরীকে কুবেরের কাছে পাঠাতে চাইলেন বীজ ধান ধার করার জন্য। গৌরী নিজে যেতে অসম্মত হলে শিব নিজেই গিয়ে কুবেরের কাছ

থেকে বীজ ধান ধার করে আনলেন। মাঘ মাসের শেষ দিকে খুব বৃষ্টি হল। অনুচর ভীমকে নিয়ে শিব জমি চাষ করলেন। যথাসময়ে ধান রোপণ করা হল, প্রচুর ধান হল। নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি ধার করে এনে ভীম ধান ভানল। গৌরীর সংসারেও আর অভাব রইল না। কিন্তু শিব মর্ত্যে গিয়ে চাষবাসে এমন মত্ত হয়ে পড়েছেন যে কৈলাসে ফেরার আর নামও করেন না। গৌরী তাঁকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তিনি উঙানি মশা দিয়ে মর্ত্য ছেয়ে ফেললেন। মশার কামড়ে শিব অস্থির হলেন, তবুও কৈলাসে ফেরার নাম করলেন না। গৌরী তখন ডাঁশ ও মাছি পাঠালেন। সর্বাঙ্গে ঘি মেখে শিব তাদের কামড় থেকে অব্যাহতি পেলেন। তারপর জোঁকের উপদ্রব আরম্ভ হল। তবু শিব গৌরীর প্রতি উদাসীন, মেতে রইলেন চাষবাসেই।

১০.৫.২ ৭ম পালায় (বাগদীপালা) স্থান পেয়েছে অবশেষে গৌরী বাগদিনীর রূপ ধরে শিবের কৃষিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। শিবের ক্ষেতে তিনি মাছ ধরতে লাগলেন; তাতে ছড়া থেকে ধান ঝরে পড়তে লাগল। তবু বাগদিনীকে কিছু বললেন না শিব; বরং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। বললেন, বিবাহ করলে তিনি খেতের জল সেঁচে বাগদিনীকে মাছ ধরতে সাহায্য করবেন। এমনকি বাগদিনীকে খুশি করতে শিব খেতের জল সেঁচে মাছও ধরতে লাগলেন। বাগদিনী শিবের কাছ থেকে একটি পিতলের আংটি চেয়ে নিলেন। এইবার শিব বাগদিনীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করলেন। আলিঙ্গন দেওয়ার ছল করে বাগদিনী শিবকে কৈলাসের পথে নিয়ে যেতে শুরু করলেন; শিবও তাঁর পিছু নিলেন। বাগদিনী গৌরীর রূপ ধরে কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু শিবকে তিনি ঘরে ঢুকতে দিলেন না। বললেন, বাগদিনীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে শিব তাঁকে আংটি উপহার দিয়েছেন। শিব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন; চারিদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। এমন সময় নারদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। গৌরী তাঁর কাছে শিবের ব্যভিচারের কথা জানালেন। ঝগড়া আরও পাকা করে তোলার জন্য নারদ গৌরীকে পরামর্শ দিয়ে বললেন স্বামীর কাছে একজোড়া শাঁখা চাইতে। কারণ, শাঁখা পরলেই স্বামীর চিরদিন তাঁর বশ থাকবে। কিন্তু শিব ভিখারি, তিনি স্ত্রীর শাঁখা কী করে জোগাড় করবেন, ভেবে পেলেন না।

১০.৫.৩ জাগরণ পালায় (শঙ্খপালা) দেখা যায় অভিমান করে গৌরী বাপের বাড়ি চলে গেলেন। বাপের বাড়িতে তখন দুর্গোৎসব। নারদ শিবকে পরামর্শ দিলেন, গৌরীকে ফিরিয়ে আনতে তিনি যেন শাঁখারি সেজে হিমালয়ে যান, তারপর নিজে হাতে শাঁখা পরিয়ে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। অগত্যা শিব তাই করলেন। শাঁখারির বেশ ধরে তিনি হিমালয়ে গেলেন। শাঁখা দেখে গৌরীর আহ্লাদের সীমা রইল না। শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করলে শিব বললেন, এর মূল্য আত্মসমর্পণ। গৌরী শিবকে চিনলেন। তিনি দশ হাত বাড়িয়ে দিলেন, শিবও তাঁর হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। গৌরীর অভিমান দূর হল। তিনি কৈলাসে ফিরে এলেন।

১০.৬ চরিত্র বিশ্লেষণ

কাব্যের শেষ তিনটে পালায় প্রধান চরিত্রদের মধ্যে রয়েছেন, শিব এবং পার্বতী। তাঁরা ছাড়া কাব্যে রয়েছেন আরও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র। তাঁরা হলেন ভাগ্নে নারদ, ভৃত্য ভীম, মাতা মেনকা প্রভৃতি।

শিব : শিবায়ন কাব্যের কাহিনি এগিয়েছে শিব চরিত্রকে কেন্দ্র করে। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটে তাঁর। অতিরিক্ত অর্থাভাবে পড়ে মহাদেবের স্ত্রী পার্বতী তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। রাগ করে অনেক কটু কথাও স্বামীকে শুনিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বামীকে চাষ করার পরামর্শও দেন। পত্নী পার্বতীর পরামর্শে প্রথমে মহাদেব চাষ করতে চাননি। তিনি চাষের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে পার্বতীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, চাষ থেকে কোনো ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সম্পর্কে তিনি পার্বতীকে বলেছেন,

"ভিক্ষা দুঃখে আছি সুখে আছি অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।।.....
অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত।।"

এখানেও মহাদেব থামলেন না। তিনি পার্বতীকে চাষবাস ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা করার কথা বলেন। তাঁর মতে চাষ করার থেকে ব্যবসা বেশি পরিমাণে লাভদায়ক ফল দিতে পারে। চাষবাসই শুধুমাত্র তিনি করতে পারবেন, কোনো ধরনের ব্যবসা মহাদেবের দ্বারা হবে না, পার্বতী একথা পরিষ্কারভাবে স্বামীকে বুঝিয়ে দেন। স্ত্রীর পরামর্শে অগত্যা মহাদেব চাষবাস করার কথা মেনে নেন। কিন্তু চাষবাস করাও তো সহজ কথা নয়। তাঁর কাছে 'হালুয়া' (হাল চালক), 'লাঙ্গল' (হাল চাষ করার যন্ত্র) ইত্যাদি কিছুই তো নেই। এই সম্পর্কে তিনি স্ত্রীকে বলেছেন,

"কোথা হেল্যা কোথা হালুয়া কোথা বা লাঙ্গল।"

পার্বতী শিবের চাষ সম্পর্কিত সমস্ত অসুবিধা দূর করে দেন। তাঁরই পরামর্শে ইন্দ্রের কাছ থেকে শিব চাষের উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহ করেন, বিশ্বকর্মা লাঙ্গল, মই, কোদাল— ইত্যাদি তৈরি করে দেন। কুবেরের কাছ থেকে তিনি বীজ ধান সংগ্রহ করেন। সেবক ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চাষ করার উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন। জমিতে কাজ করে করে ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত ভীমকে ভাত খাইয়ে শান্ত করেন তিনি। যথা সময়ে মাঠ ধানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মাঠের ফসল দেখে শিবের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই সম্পর্কে কবি বলেছেন,

"হরষ হ'য়ে হর ধান্য দেখে অবিশ্রাম।"

দেখতে দেখতে আষাঢ় মাস চলে এল। আষাঢ়ের প্রথম দিনই বর্ষা নেমে নদী, নালা ইত্যাদি সমস্ত জলাশয় পূর্ণ করে দেয়। বর্ষাকাল, শিব পাশে নেই। পার্বতী চিন্তিত হয়ে পড়েন। অপরদিকে মহাদেব চাষের কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত। দীর্ঘদিন হয়ে গেল তিনি বাড়িতে আসছেন না। পার্বতী ছলনা করে মাছি, ডাঁশ মাছি, জোঁক ইত্যাদি প্রাণীদের শিবের কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁকে বশ করার জন্য। কিন্তু কোনো বাধাই শিবকে তাঁর কাজ থেকে সরাতে পারে না। অবশেষে পার্বতী বাগদিনী বেশে মাছ ধরার ছলনা করে শিবের ধান ক্ষেতে প্রবেশ করেন। মহাদেবও বেশ বুদ্ধিমান। তিনি ভীমের মুখে বাগদিনীর কথা

শুনে আন্দাজ করতে পারেন, বাগদিনীরূপে পার্বতীই তাঁর ধানক্ষেতে প্রবেশ করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি ভৃত্য ভীমকে বলেছেন,

"মোর মনে হেন লয় বাগদিনী সে ত নয়
কদাচ না হয় তোর মামী।"

বাগদিনীর কাছে তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চান। তিনি বাগদিনীর সঙ্গে অনেক ধরনের মাছ ধরেছেন। বাগদিনীর আচরণে মুগ্ধ হয়ে বাগদিনীর কাছেই পার্বতীর নিন্দা করেছেন। তিনি বাগদিনীকে একটা মূল্যবান আংটি উপহারও দিয়েছেন। ছলনাময়ী পার্বতী আংটি নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন। মহাদেব কৈলাসে ফিরে এলে পার্বতী আংটির সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান তাঁর সেই আংটি কোথাও হারিয়ে গেছে। কিন্তু পার্বতী যখন বলেন যে, যাঁকে তিনি আংটিটি উপহার দিয়েছেন, সেই তিনিই শিবের কাছ থেকে আংটি পাওয়ার কথা তাঁকে বলে গেছেন। তখন শিবের আর কিছু বলার থাকে না। তবে, তিনিও হেরে যাওয়ার পাত্র নন। নারদের পরামর্শে পার্বতী যেমন করে বাগদিনীর বেশে তাঁর সঙ্গে লীলা করেছেন, তিনিও পার্বতীর সঙ্গে সেই ধরনের লীলা করার কথা চিন্তা করেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ভাগ্নে নারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

নারদের পরামর্শে পার্বতী নিজের শাঁখা পরার ইচ্ছের কথা মহাদেবের কাছে প্রকাশ করেন। নারদ নারীদের শাঁখা পরার সাধের কথা পূর্ব থেকেই মামা মহাদেবের কানে দিয়ে রেখেছিলেন। এই বিষয়ে মহাদেব পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। স্বামী শিবের শাঁখা পরানোর ক্ষমতা নেই বুঝতে পেরে পার্বতী পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দেবীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভাগ্নে নারদের পরামর্শে প্রথমে তিনি বাঘ হয়ে রাস্তা ধারে বসে রয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ভয় পেয়ে দেবী বাড়ি ফিরে আসবেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। তখন শিব দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন তৎক্ষণাৎ যেন ঝড়-বৃষ্টি নামে, তাতে পথে বাধা পেলে পার্বতী বাড়ি ফিরে আসবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় মহাদেবের ইচ্ছানুসারে প্রচণ্ড ঝড়-বাদল মহাগর্জন করে উমার পথে নেমে এল। পথে পুত্র কার্তিক এবং গণেশও তাঁদের মা'কে বোঝাতে চেষ্টা করেন। গণেশের পরামর্শে উমা শিবকে স্মরণ করেন। শিবের কৃপায় দুর্গম যাত্রাপথে তাঁরা 'অনাদি মণ্ডপ' দেখতে পায়। সবাই মিলে সেই মণ্ডপে প্রবেশ করার পর তাঁরা সেখানে একজন বৃদ্ধকে দেখতে পান। বৃদ্ধরূপী শিবের কাছে পার্বতী নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে বলেন যে, শুধুমাত্র শাঁখা পরতে চাওয়ার অপরাধে তাঁর স্বামী শিব তাঁকে ত্যাগ করেছেন। তাই তিনি পুত্রদের নিয়ে পিত্রালয়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধরূপী শিব পার্বতীকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। তিনি পার্বতীকে বলেন,

"অপরাধ ক্ষমা করি ফের একবার। .....
জলহীন হৈলে মীন জীয়ে নাহি যেন।
শৈলসুতা বিনা শিব হ'বে শব হেন।।"

বৃদ্ধবেশী শিবের কথায়ও কোনো লাভ হয় না। পার্বতী পুনরায় পিত্রালয়ের দিকে এগিয়ে চলেন। মহেশের মায়ানদী পার হতে হবে। এবার শিব আসেন ভাঙা নৌকার কর্ণধার সেজে। তিনি আগে পুত্রদের নদীর ওপারে রেখে আসেন। এবার উমাকে ভাঙা নৌকায় তুলে ওপারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। মাঝনদীতে যাওয়ার পর প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে শুরু করে। মায়ের চিন্তায় কুমারেরা কাঁদতে শুরু করেন। শিবের সৃষ্ট কোনো বাধাতেই পার্বতী পিত্রালয়ে যাবার পথ থেকে ফিরে আসেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর নিজের রথ পাঠিয়ে দেন দেবীর কাছে। অবশিষ্ট পথ তিনি সেই রথে সমাপ্ত করে তাঁর পিত্রালয়ে পৌঁছতে সক্ষম হন। পিত্রালয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সবার সঙ্গে বিভিন্ন উপাচারে দেবীর সেবা হল। বারো দিন পূজা হল শাস্ত্র মতে, শুধুমাত্র তিনটে দিন বাকি। সেই সময় শিব পার্বতীর কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। এবার তাঁর আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। তিনি মাধব শাঁখারির বেশ ধারণ করে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মাথায় শাঁখার টুকরি নিয়ে হিমালয়ের ঘরে পার্বতীর কাছে চলে যান। খুব সুন্দর নক্সা করা দুটো শাঁখা তিনি পার্বতীর হাতে পরাতে যান। শাঁখারিকে দেখে পার্বতী শিবের স্বরূপ বুঝতে পারেন। ছলনা করে তিনি এবার শাঁখারির পরিচয় জানতে চান। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে শিব পার্বতীকে বলেন,

"দুঃখের দেখিয়া দশা দোষ দিয়া মোরে।
গৌরী নামে গৃহিণী গিয়াছে বাপ ঘরে।।"

শিব দেবীর শাঁখা পরার সাধ পূর্ণ করেন এবং হর পার্বতীর পুনর্মিলন ঘটে।

পার্বতী : শিবায়ন কাব্যে মহাদেবের পাশাপাশি মাতা পার্বতীও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়। কাব্যে দেখা যায়, স্বামীর স্বল্প আয়ে সন্তানদের নিয়ে অতি কষ্টে সংসারে চালান তিনি। তবে, তিনি বেশ বুদ্ধিমতী। স্বামীর আয় বাড়ানোর উপায় জানেন তিনি। তাই স্বামী শিবকে তিনি চাষবাস করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। শিব ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করার কথা স্ত্রীকে বলেছিলেন। পার্বতী শিবের সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। তাই তিনি শিবকে চাষের কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি কাব্যে বলেছেন,

"চাষ বিনা আর কোন্ কর্ম্ম-যোগ্য তুমি।।"

পার্বতীর পরামর্শে শেষ পর্যন্ত শিব চাষ করার কথা মেনে নেন। তবে, এখানেই শেষ নয়। হালুয়া নেই, লাঙ্গল নেই— ইত্যাদি বলে শিব চাষের কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছেন দেখে পার্বতী চাষ করার সমস্ত উপকরণ উপলব্ধ করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর পরামর্শে শিব ইন্দ্রের কাছ থেকে চাষের উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহ করেন, বিশ্বকর্মার সাহায্যে লাঙ্গল, মই, কোদাল— ইত্যাদি লাভ করতে সক্ষম হন, আবার কুবেরের কাছ থেকে শিব বীজ ধানও পেয়ে যান। চাষ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করার পর ভৃত্য ভীমকে সঙ্গে দিয়ে পার্বতী স্বামীকে চাষের কাজে মাঠে পাঠিয়ে দেন। স্বামীকে চাষের কাজে পাঠিয়ে বিরহী পার্বতী কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না। তাঁর মনের অবস্থার বর্ণনা কবি এইভাবে দিয়েছেন,

"জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।"

শিব চাষের কাজে ব্যস্ত। এদিকে বর্ষাকাল এসে পড়েছে। বৃষ্টির জলে সমস্ত জলাশয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সেই অবস্থায় মাতা পার্বতী স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। পদ্মাবতী প্রভৃতিরা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেও তাঁর মন শান্ত হয় না। দীর্ঘদিন ধরে শিব বাড়ি ফিরে আসছেন না। চিন্তিত মনে পার্বতী দিন কাটাচ্ছেন। সেই অবসরে একদিন ভাগ্নে নারদ এসে মামী পার্বতীকে মামা শিবের গণ্ডগোল চারিত্রিক দোষের কথা জানান। শিবকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার বেশ কয়েকটি উপায় ভাগ্নে নারদ মামীকে বলেন। নারদের পরামর্শ মতো মামী পার্বতী শিবকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য ছলনা করে 'উঙানি' (এক প্রকার ক্ষুদ্র মাছি), মশা, 'মাছি ডাঁশ' ইত্যাদি পাঠিয়ে দেন। পার্বতী মনে মনে ভাবেন, মশা মাছি ইত্যাদির যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে এবার শিব নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে আসবেন। স্বামী শিব সম্পর্কে মাতা পার্বতীর ধারণা ভুল ছিল না। কাব্যে দেখা যায়, মশা-মাছি ইত্যাদির অত্যাচারে ভৃত্য ভীমের পরামর্শে শিব বাড়ি ফিরে আসার কথা ভাবছেন। তবে, তিনি চাষের কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পার্বতী অপেক্ষা করে আছেন। এত কিছু করার পরও শিব বাড়ি ফিরছেন না। তাই, এবার তিনি ছলনা করে শিবকে উত্যক্ত করার জন্য জোঁক পাঠিয়ে দেন। জোঁকের যন্ত্রণাও শিবকে মাঝপথে চাষের কাজ বন্ধ করে বাড়ি ফেরাতে পারলো না। দেখতে দেখতে কার্তিক মাসেরও অনেকটা দিন কেটে গেল, শিব বাড়ি ফিরে এলেন না তখনও।

পার্বতী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। পদ্মাবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বাগদিনীর বেশে শিবের ধান ক্ষেতে এসে প্রবেশ করেন। মাঠে শিবের পরিশ্রমের সুন্দর ফসল দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। শিবকে ছলনা করার জন্য তিনি ধান ক্ষেতের ভেতরের জলে মাছ ধরতে নামেন। ভৃত্য ভীম দেখতে পায়, জনৈক বাগদিনী নারী ধান ক্ষেত নষ্ট করছেন। ভীমের সঙ্গে মাতা পার্বতীর বেশ কিছু তর্কাতর্কি হয়। ভীম মাতা পার্বতীকে শিবের ভয় দেখালে তিনি বলেন, "আমার কি করিবে বুড়া।" ভীম নিজে পার্বতীর ছলনাকে সামলাতে না পেরে শিবের কাছে গিয়ে বাগদিনীর কথা জানায়। ভীমের মুখে বাগদিনীর কথা শুনে শিবের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি ভীমকে বুঝিয়ে বলেন,— বাগদিনী পার্বতী হতে পারেন, তাই তাঁর আসল পরিচয়টা জানতে হবে। ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কাছে গিয়ে তিনি বাগদিনীর আসল পরিচয় জানার চেষ্টা করেন। শিবের প্রশ্নের উত্তরে মাতা পার্বতী তাঁকে নিজের পরিচয় দেন। তিনি শিবকে বলেছেন,

"মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী।.....
মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি।।"

বুঝতে পারা যায়, ছলনার আশ্রয় নিলেও দেবী পার্বতী নিজের সঠিক পরিচয়ই দিয়েছেন। অপরদিকে শিব বাগদিনীর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে নিজের স্ত্রী পার্বতীর নিন্দা করেছেন। বাগদিনীরূপিণী ছলনাময়ী দেবীর আগ্রহে শিব জল সেচে দিয়েছেন। তাঁরা কাতলা, রুই, পাগাস, চিতল, মৌরলা, খলসে,

ট্যাংরা, শোল, বাটা, কালুবাইশ (কালিবাউশ), ইলিশ, ভেটকি, আইর, মাগুর, গড়ই, পুঁটি, পাবদা—ইত্যাদি মাছ ধরেছেন। অবশেষে তিনি শিবের কাছ থেকে মূল্যবান আংটি নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আংটির কথা জিজ্ঞাসা করলে শিব তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেন না। পার্বতী ভাগ্নে নারদের পরামর্শে শিবকে ছলনা করার জন্য বাগদিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন। এবার ভাগ্নের পরামর্শে শাঁখারির বেশ ধারণ করার পরিকল্পনা করেন মামা শিব। জাগরণ পালায় দেখা যায়, ভাগ্নে নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর শাঁখা পরার সাধ হয়। পার্বতী বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামীর সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ তাঁর এ সাধ পূর্ণ হবার নয়। তাই তিনি পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে শিব বিভিন্ন ছলনায় দেবীর সামনে উপস্থিত হন। একবার একজন বৃদ্ধের রূপে দেবীর সামনে উপস্থিত হন। দেবী সেই বৃদ্ধকে নিজের দুর্দশার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"অপরাধ কিনা মেয়ে শঙ্খ চেয়েছিল।
তার তরে বিভু মোরে বিসর্জ্জন দিল।।"

—অর্থাৎ শুধুমাত্র শাঁখা পরার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য শিব তাঁর স্ত্রী উমাকে ত্যাগ করেছেন। শাঁখারীর বেশ ধারণ করে শিব দেবীর শাঁখা পরার সাধ পূর্ণ করেন এবং হর পার্বতীর পুনর্মিলন ঘটে।

নারদ : ভাগ্নে নারদ প্রয়োজনে মামা শিব এবং মামী পার্বতী দুজনকেই বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন বুদ্ধি দিয়েছেন। তাতে, তাঁদের জীবন আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন, কয়েকমাস কেটে যাওয়ার পরও মামা শিব যখন বাড়ি ফিরে আসছেন না, তখন তিনি মামী পার্বতীকে বলেছিলেন যে,—মাছি, ডাঁশ মাছি, মশা, জোঁক পাঠিয়ে শিবকে যন্ত্রণা দিলে শিব কৈলাসে ফিরে আসতে পারেন। আবার তাতেও যদি শিব কৈলাসে ফিরে না আসেন, তবে মামী পার্বতী বাগদিনী রূপ গ্রহণ করে শিবের কাছে গিয়ে সশরীরে শিবকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। ভাগ্নের পরামর্শ মতো মামী পার্বতী কাজ করেছেন। বাগদিনী রূপে পার্বতীর ছলনায় শিব পরাজিত হলে তিনি নিজেও পার্বতীকে ছলনা করার কথা ভাবলেন, তখন ভাগ্নে মামা শিবকে শাঁখারির ছদ্মবেশ ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মামা শিবও ভাগ্নের পরামর্শ মতো কাজ করেছেন। তবে, শিব যেমন ছলনাময়ী বাগদিনীরূপিণী পার্বতীর স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন, ঠিক তেমনি পার্বতীও শাঁখারিরূপী শিবের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তবে, ভাগ্নের পরামর্শ মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের দুষ্ট-মিষ্টি ছলনা এবং তার সমাপ্তিতে দুজনের সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ প্রেমময় জীবন পাঠকদের আপ্লুত করে। এই বিষয়গুলো বিচার করে দেখলে বলা যায়, কাব্যের কাহিনি বিন্যাসের প্রয়োজনে নারদ শিবায়ন কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

ভীম : কাব্যে ভীম চরিত্রটি ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। তবে, তার ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পার্বতীর পরামর্শে শিব যখন চাষের কাজে বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন মাতা পার্বতী তাকেই শিবের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। সে ছায়ার মতো সারাক্ষণ শিবের সঙ্গে ছিল। সে শিবকে মামা এবং পার্বতীকে মামী বলে সম্বোধন করে। খিদের যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারে না। তাড়াতাড়ি খেতে না দিলে

সে শিবকে পার্বতীর কাছে চরিত্রহীন প্রমাণ করে দেওয়ার ভয় দেখায়। এই সম্পর্কে সে মামা শিবকে বলেছে,

"মামী জিজ্ঞাসিলে আমি ক'য়ে দিব ভাল।
কোঁচনীকে ল'য়ে মামা পলাইয়া গেল।।"

অবশ্য সময় মতো ভাত খেতে পেলে সে শান্ত হয়ে যায়। কবির কলমে এই ভীমও একটি বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে।

মেনকা : কাব্যে তিনি উমার মাতা এবং হিমালয়ের স্ত্রী। পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে পার্বতী দেবরাজ ইন্দ্রের রথে চড়ে উমা এসেছেন পিত্রালয়ে। বনবাস থেকে রাম যখন অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন তখন সমগ্র অযোধ্যাবাসী রামকে পেয়ে তাদের পুরনো সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছিল, তেমনি কন্যা উমাকে কাছে পেয়ে হিমালয়ের রাজ্যেও উৎসব শুরু হয়ে যায়। তারা উমাকে পেয়ে পরম সুখ উপলব্ধি করে। অযোধ্যাবাসীদের মতো তারাও তাদের পুরনো সমস্ত দুঃখ ভুলে যায়। কন্যা বাড়ি এসেছেন শুনে মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয় দৌড়ে আসেন তাঁদের আদরের কন্যাকে দেখতে। মাতা মেনকা দীর্ঘদিন পর কন্যাকে দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন না। তিনি তাঁর আদরের কন্যার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন। কন্যাকে বিবাহের মাধ্যমে পরের ঘরে পাঠিয়ে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। কন্যাকে নিয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তায় দিন কাটত তাঁর। এই সম্পর্কে তিনি উমাকে বলেছেন,

"পাঠায়ে পরের ঘরে, কাঁদিয়া তোমার তরে,
অভাগী মায়ের দেখ হাল।
ভাল হৈল আইলে তুমি, আর না পাঠাব আমি
মোর ঘরে থাক চিরকাল।"

—অর্থাৎ কন্যার জন্য দুশ্চিন্তায় কেঁদে কেঁদে মা মেনকা নিজের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছেন। তাই এখন তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে চাইছেন। এখন একবার যখন কন্যাকে তিনি নিজের কাছে পেয়েছেন, আর তিনি তাঁকে আর কোথাও যেতে দেবেন না। কন্যা এখন থেকে পিত্রালয়ে মাতা-পিতার সঙ্গেই থাকবেন। বুঝতে পারা যায়, বাঙালি সমাজে বিয়ের পর কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও কন্যা যখন-তখন আর বাবার বাড়ি আসতে পারে না। কন্যার মাতা-পিতা অপেক্ষার দিন গুণতে থাকেন। তাঁদের অপেক্ষার দিন যেন আর শেষই হয় না। কাব্যের উমা তেমনই একজন বিবাহিতা কন্যা, মাতা মেনকা তেমন একজন বিবাহিতা কন্যার মাতা এবং পিতা হিমালয়ও তেমনই একজন বিবাহিতা কন্যার পিতা। এখানে মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয় যেন বাঙালি সমাজের মাতা-পিতাদের মতো তাঁদের কন্যাকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে অধীর আগ্রহে কন্যার বাড়ি আসার অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন পর তাঁরা তাঁদের কন্যাকে কাছে পেয়েছেন। এখন তাঁরা আর তাঁদের

কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে আগ্রহী নন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শাক্ত পদাবলীর গৌরীর মাতা মেনকার সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের উমার মাতা মেনকার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বেশ মিল রয়েছে। শাক্ত পদাবলিতে দেখা যায়, উমার মাতা মেনকা গিরিরাজকে বলেছিলেন, "গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।" তবে, এ কথা সত্য সন্তানদের স্নেহের ক্ষেত্রে চিরকালের মায়েরা একই।

১০.৭ নামকরণ

মঙ্গলকাব্যগুলোতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম অনুসারে কাব্যের নামকরণ করা হয়। যেমন-- অন্নদামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী অন্নদা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র দেবী চণ্ডী, মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন দেবী মনসা— ইত্যাদি। এই কাব্যেও দেখা যায়, কাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন শিব। শিবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই কাব্য, তাই এই কাব্যের নাম শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন করা হয়েছে। এই কাব্যে শিবের দুটো রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এক. পৌরাণিক শিব, দুই. লৌকিক শিব। কবির কলমে পৌরাণিক শিব থেকে লৌকিক শিব বেশি উজ্জ্বল এবং বাস্তবরূপে অঙ্কিত হয়েছেন। লৌকিক শিবের স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে রয়েছে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র পরিবার। এই পরিবারের স্বামী অর্থ উপার্জন করেন এবং স্ত্রী বাড়িতে রান্নাবান্না করে সবার মুখে অন্ন তুলে দেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুষ্টু-মিষ্টি সংঘাত এবং মান-অভিমানের পর্ব। দুজন দুজনকে কাছে না পেলে যেমন চিন্তিত হয়ে পড়েন, তেমনি দুজন কাছাকাছি থাকলে ঝগড়াও করেন। অভিমানী স্বামী এবং অভিমানী স্ত্রী, প্রয়োজনে দুজন দুজনের অভিমান দূর করার চেষ্টা করেন। মান-অভিমান ভুলে আবার তাঁরা সুখে সংসার করেছেন।— এই সমস্ত কিছু বিচার করে দেখলে বলা যায়, এই কাব্যের নামকরণ সার্থক।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। শিবায়ন কাব্যের নামকরণ বিষয়ে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- রামেশ্বর চক্রবর্তী শিবায়ন কাব্যটি অষ্টাদশ শতকে রচনা করেছেন।
- এই কাব্যে শিবের লৌকিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়।
- কাব্যটিতে মোট আটটি পালা রয়েছে।
- শিবায়ন কাব্যটি প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের থেকে পৃথক।

- শিবায়ন কাব্যের শেষ তিনটি পালার কাহিনি এবং চরিত্র সৃষ্টিতে কবি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: শিবায়ন শাখার সব থেকে জনপ্রিয় কবি হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য)।..... সেই সময় কবি যশোমন্ত সিংহের সভাকবির পদ লাভ করেছিলেন। ..... এই কাব্যগুলোর মধ্যে শিবায়নকে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মঙ্গলকাব্য গুলোতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম অনুসারে কাব্যের নামকরণ করা হয়।..... এই কাব্যে শিবের দুটো রূপ দেখতে পাওয়া যায়।..... এই সমস্ত কিছু বিচার করে দেখলে বলা যায়, এই কাব্যের নামকরণ সার্থক। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

১০.১০ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ

১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে ? মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

২। রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন কাব্যের পঠিত অংশ অবলম্বন করে শিব চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৩। রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন কাব্যের পঠিত অংশ অবলম্বন করে পার্বতী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৪। শিবায়ন কাব্যে স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের কেন্দ্র করে যে একটা ক্ষুদ্র পরিবারের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, পঠিত অংশ অবলম্বন করে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৫। বাগদিনীরূপিণী পার্বতী সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ টীকা প্রস্তুত করুন।

৬। শাঁখারিরূপী শিব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। মামা শিব এবং মামী পার্বতীর জীবনে ভাগ্নে নারদের ভূমিকা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

৮। টীকা লিখুন : ভীম অথবা মাতা মেনকা

*** *** ***